দাদু

(গল্পগ্রন্থ – জ্যোতিরিঙ্গণ)

ঠাকুরদাদা আমার শৈশবের অনেকখানি জুড়ে আছেন। সমস্ত শৈশব-দিগন্তটা জুড়ে আছেন।

ছেলেবেলায় জ্ঞান হয়েই দেখেছি আমাদের বাড়িতে তিনি আছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় একশ। জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত দেখেছি তিনি আমাদের পশ্চিমের ঘরের রোয়াকে সকাল থেকে বসে থাকতেন। একটা বড় গামলায় গরম জল করে দিদি তাঁকে নাইয়ে দিত।

ঠাকুরদাদা চোখে ভালো দেখতে পেতেন না। তাঁকে সকালে হাত ধরে রোয়াকে নিয়ে এসে তাঁর জায়গাটিতে বসিয়ে দিতে হত। তামাক সেজে দিত দিদি। কেবল মা ঠাকুরদাদার ভাতের থালাটি নিয়ে গিয়ে তাঁকে খাইয়ে আসতেন। দিদি আবার তামাক সেজে দিত।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরদাদা বসে বসে আপনমনে কি বকতেন। একটু বেশি বেলায় বাবা নায়েবি করে কাছারি থেকে ফিরে বাড়ি ঢুকলেই ঠাকুরদাদা অমনি কান খাড়া করতেন।

—কে এল? হরিশ ?

—হ্যাঁ বাবা।

—বাবা হরিশ, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।

—সে কি বাবা, আপনাকে এখনো ভাত দেয়নি?

—না বাবা। খিদেয় মরছি, অ হরিশ। ভাত দিতে বলে দে।

বাবার বয়স পঞ্চাশের ওপর। মাথার চুল প্রায় সব সাদা হয়ে গিয়েছে, বেশ মোটা-সোটা নাদুস-নুদুস চেহারা, সবাই বলে বাবা নাকি দেখতে সুপুরুষ।

বাবা মাকে অনুযোগ করলেন—আচ্ছা বাবাকে এখনো ভাত দাওনি? ছি ছি, এত বেলা হল!

মা বললেন—ওমা, সে কি গো! দশটার সময় যে আমি নিজের হাতে খাইয়ে এসেছি!

বাবা চেঁচিয়ে ডেকে বললেন—ও বাবা—

—কি হরিশ?

—আপনাকে আপনার বৌমা খাইয়ে এসেছে যে? কি বলছেন আপনি?

—না না, অ হরিশ, মিথ্যে কথা। আমারে কেউ ভাত দেয়নি, না খেয়ে মলাম আমি—

বলেই ঠাকুরদাদা ছেলেমানুষের মতো খুঁৎখুঁৎ করে কান্না শুরু করে দিলেন।

মা রাগ করে বলে উঠলেন—বুড়ো বাহাত্তুরে, মরেও না, সাতকাল জ্বালাবে। তোমার সাধের হিমি গিয়ে তোমায় খাওয়াক মাখাক—আমি আর যদি কাল থেকে তোমায় দেখি, তবে আমি বেণী মুখুজ্যের—

বাবা দুঃখিত স্বরে বললেন—আহা-হা, বড়বৌ —ছেলেপিলের সামনে—

—কি ছেলেপিলের সামনে? কে না জানে সোহাগের হিমির কথা? বাহাত্তুরে বুড়ো, চারকালে গিয়ে ঠেকেছে—

—আহা-হা বড়বৌ! অমন করে গুরুজনকে বলতে আছে? ছি ছি, তোমার মুখখানা আজকাল বড্ড—

ঠাকুরদাদা তখনো কিন্তু কাঁদছেন ছেলেমানুষের মতো।

কান্নার মধ্যে ডাকলেন—অ হরিশ!

যেন অসহায় আর্ত বালক তার একমাত্র আশ্রয়স্থল পিতাকে ডাকছে।

বাবা জামা-টামা না খুলেই ছুটে গেলেন, সান্ত্বনার সুরে বললেন—কি বাবা, কি ?

—আমি ভাঁত খাঁব—আঁমি না খেঁয়ে মলাম, অ হঁরিশ। ওরা আঁমায় নাঁ খেঁতে দিয়ে মাঁরবে—খুঁৎখুঁৎ।

—বাবা কাঁদবেন না। কাঁদতে নেই। ছিঃ, অমন কাঁদতে আছে?

মা অমনি এ রোয়াক থেকে বলে উঠলেন—আ মরণ, বুড়ো বাহাত্তুরের মরণ দ্যাখ না, যেন দু বছরের খোকা, ছেলের কাছে কেঁদেই খুন—যমের ভুল এমনও হয়!

বাবা বলেন—আঃ, চুপ কর না বড়বৌ—কি কর।

ঠাকুরদাদা আবার বলেন—খিদে পেয়েছে—ভাত খাব—

—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি দেখছি—আপনি চুপ করুন।

অবশেষে আবার সামান্য দুটি ভাত বাবা নিয়ে দিয়ে এলেন। ঠাকুরদাদা দিব্যি খেতে বসে গেলেন আবার। মুখে আর হাসি ধরে না।

আমরাও ঠাকুরদাদার কাণ্ড দেখে হেসে বাঁচিনে।

এমনি একদিন নয়, মাসের মধ্যে দশ দিন হত। ইতিমধ্যে দিদি শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। বাবাকে দেখতাম, ঠাকুরদাদার যত কিছু কাজ নিজের হাতে করতেন। কিন্তু তাঁর সময় নেই, সকালে উঠে সন্ধ্যাহ্নিক করে জল-বাতাসা খেয়ে তিনি বেরিয়ে যেতেন কাছারির কাজে। দুপুরে এসে খেয়ে সামান্য বিশ্রাম করে কাজে বেরুতেন, ফিরতে রাত আটটা-নটা বাজত। এসেই ঠাকুরদাদার ঘরে ঢুকে জিগ্যেস করতেন—বাবা, শরীর ভালো আছে? এদিকে ঠাকুরদাদাও সারা দিনের যত অভাব-অভিযোগের কাহিনী জমিয়ে রাখতেন ছেলের সামনে পেশ করবার জন্যে সেই সময়।

—আর বাবা, শরীর ভালো! একটু তামাক, তা কেউ দেয় না। টিকে ভিজে, আগুনও ধরল না। আজ এমন মশা কামড়াতে লাগল দুপুরবেলা, মশারিটা কেউ টাঙিয়েই দিলে না—এই দ্যাখ না পিঠটা—

তার পর কাঁদ-কাঁদ সুরে বললেন—তুই একটু হাত বুলিয়ে দে হরিশ—বাবা বসে বসে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন।

—তুই বাড়ি না থাকলে আমাকে সবাই অগ্রাহ্যি করে। এক ঘটি জল চাইলে সময়মতো দ্যায় না বাবা।

—সত্যি তো! আহা, আমি সব বলে ঠিক করে দেব এখন।

—দিস। ভালো করে বলে দিয়ে যাস তো।

—দেব।

—তোর খাওয়া হয়েছে?

—না বাবা, এই তো এলাম।

—যা তুই, হাত-পা ধুয়ে জল-টল খা—তোকে পেটভরে খেতে দিচ্ছে তো?

—হ্যাঁ বাবা।

—দেখি সরে আয় তো! একুট মোটা-মোটা হলি, না সেই রকম আছিস? জানিস, ছেলেবেলায় তোর শরীর ছিল এমনি রোগা! তোর গর্ভধারিণী একদিন বললে, খোকার জন্যে ছাগলের দুধের ব্যবস্থা কর। তখন মেহেরপুরে নীলকুঠিতে কাজ করি। সেইখানেই তোর জন্ম, জানিস তো? হ্যাঁ মেহেরপুরের—ইয়ে—ঐ কি বলছিলাম ভুলে গেলাম—আজকাল কিছু মনেও থাকে না।

—ছাগলের দুধ।

—হ্যাঁ, ছাগলের দুধ আনতে বললে তোর গর্ভধারিণী। সাহেবের একটা বড় ছাগল ছিল। মালীর সঙ্গে ষড় করে ফেললাম, মাসে দু টাকা করে দেব—আর সে আধ সের করে ছাগলের দুধ আমায় দেবে—

বাবা ওঠেন না সেখান থেকে, যতক্ষণ ঠাকুরদাদা একুট শান্ত না হন।

ভাত খেয়ে বাবার সঙ্গে গল্প করে ঠাকুরদাদা খুশিমনে বলেন—তা হলে তুই এখন যা হরিশ, খেয়ে নিগে—দুধ পাচ্ছিস তো?

—হ্যাঁ বাবা।

—ভালো করে দুধ খাবি। দুধেই বল।

—না বাবা, দুধ ঠিক খাচ্ছি।

বাবা চলে গেলেন। যাবার আগে ঠাকুরদাদাকে বিছানায় শুইয়ে নিজের হাতে একটা মোটা চাদর ওঁর গায়ে ঢেকে দিলেন।

—চাদর খুলবেন না বাবা, ঠাণ্ডা লাগবে।

মা বকতেন—হল বাপের সেবা? বাব্বাঃ, এমন কীর্তিও কখনো দেখিনি!

বাবা একটু লজ্জা ও সঙ্কোচের সঙ্গে বলতেন—আঃ, চুপ কর—

—কেন চুপ করব? বুড়ো বাপের আবদার যেন দু বছরের খোকার আবদার—এমন কাণ্ড যদি কখনো দেখেছি।

—না দেখেছ না দেখেছ, থাম তুমি। ঐ যে-কদিন বুড়ো আছে, তার পর আর—

—সে সবাই জানে, তার পর কি আর তুমি বুনোপাড়ার দিগম্বর বুনোর সেবা করবে? এসো, দুটো খেয়ে নিয়ে আমার মাথা কিনবে এস।

সেদিনই গভীর রাত্রে আমরা সবাই ঘুমিয়ে যখন, ঠাকুরদাদা নিজের ঘর খুলে হাতড়ে হাতড়ে বাইরের রোয়াকে এসে ডাকছেন—অ বৌমা, অ হরিশ—

বাবা ধড়মড় করে উঠে বাইরে এসে বললেন—কি বাবা, কি হয়েছে? কি হয়েছে—

—বাবা হরিশ!

—কি হয়েছে?

—বৌমা আমায় এখনো ভাত দিলে না। রাত কত হয়েছে দ্যাখ তো! আমি বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—ভাত হয়নি এখনো?

বাবা অবাক।

মা ঘুম-চোখে উঠে বললেন—কি?

—বাবা ভাত চাইছেন।

—বাব্বাঃ, হাড়-মাস কালি হয়ে গেল। ঢের ঢের সংসার দেখেছি, ঢের ঢের শ্বশুর দেখেছি কিন্তু এমনধারা কাণ্ডকারখানা কখনো শুনিওনি, কখনো দেখিওনি—

—চেঁচালে কাজ চলবে? ও কি, সব সময়—

ইতিমধ্যে আমার নির্বিকার ঠাকুরদাদা, যিনি চোখে দেখেন না, কানেও ভালো শোনেন না, আবার ডেকে উঠলেন—অ হরিশ! অ বৌমা!

—যাই বাবা, যাচ্ছি।

—আমাকে ভাত দিয়ে যাও। খিদে পেয়েছে।

বাবা গিয়ে ঠাকুরদাদাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন—অবোধ শিশুকে যেমন লোকে সান্ত্বনা দেয়। তিনি খেয়েছেন সন্ধ্যার পরেই, তাঁর বৌমা ভাত দিয়ে গিয়েছে মাগুরমাছের ঝোল দিয়ে—মনে নেই তাঁর? তাঁকে ভাত না দিয়ে কি বাড়ির কেউ খেতে পারে? এখন রাত দুটো। এখন কি ভাত খেতে আছে? এখন খেলে তাঁর অসুখ করবে। কাল সকালেই—খুব ভোরেই তাঁকে খেতে দেওয়া হবে, রাত তো ভোর হয়ে গেল। অমন করলে সবারই মনে কষ্ট দেওয়া হবে। অমন কি করা উচিত? ছিঃ।

ঠাকুরদাদা বালকের মতো আশ্বস্ত হয়ে বললেন—খেইছি?

—হ্যাঁ বাবা। আমার কথা বিশ্বাস করুন—মাগুরমাছ এনেছিলাম আপনার জন্যে হাট থেকে কিনে—তাই দিয়ে ভাত খেয়েচেন। সত্যি বলছি, আপনার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলছিনে। চলুন, শোবেন আসুন—ঠাণ্ডা লাগবে—ঘরের মধ্যে আসুন—

—আচ্ছা, আচ্ছা।

—আসুন—

বাবা হাত ধরে ঠাকুরদাদাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে যত্ন করে শুইয়ে দিয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়ে আবার এসে শুয়ে পড়লেন।

মা বললেন—সহজে মিটল?

—মেটাতে জানলেই মেটে। এখন থেকে বাবার জন্যে দুটো ভাত রেখে দিলে কেমন হয়?

—হ্যাঁ, তারপর ওই বুড়ো বয়সে পেট ছেড়ে দিক এই শেষরাত্তিরে গিলে, তখন ঠ্যালা সামলাবে কে শুনি?

বাবা ন্যায্যপক্ষেই বলতে পারতেন, যে এতকাল সামলে আসছে, সে-ই সামলাবে। কিন্তু তা তিনি বললেন না। নীরবে গিয়ে আবার নিজের ছোট্ট খাটটিতে শুয়ে পড়লেন।

কাছারির কাজে বাবাকে কয়েকদিনের জন্য গোয়াড়িতে গিয়ে থাকতে হল।

যাবার সময় বার বার মাকে বলে গেলেন, ঠাকুরদাদার যেন কোনো অসুবিধে না হয়। অযত্ন না হয় এ কথাটা বলতে বোধ হয় সাহস করলেন না, তাহলে ধুন্ধুমার ঝগড়া বেধে যাবে। ঠাকুরদাদাকে গিয়ে বললেন—বাবা, আমি গোয়াড়ি যাচ্ছি, এই পাঁচ-ছ দিন দেরি হবে। একটু বুঝে-সুঝে চলবেন, আপনার বৌমাও তো কাজের লোক, ছেলে-পুলে নিয়ে বিব্রত।

—কবে আসবি?

—বুধবার নাগাদ।

—আজ না গেলে হত না? শনিবারের বারবেলা—নিশিকান্ত তরফদার বলত মেহেরপুরের কুঠির জমানবিশ ছিল, শনিবারের বারবেলা—

—কে বললে আজ শনিবার?

—তবে কি বার?

—শুক্রবার।

—তা কি করে হয়। তুই বললি পাঁচ দিন দেরি হবে, তবে আজ শনিবার হল না?

—বাবার এত হিসেব এখনো মাথায় আছে? পাঁচ-ছ দিন, বললাম যে—আপনি ভাববেন না, কোনো অসুবিধে হবে না আপনার।

বাবা তো চলে গেলেন, এদিকে দু দিন বেশ কাটল। তার পরই ঠাকুরদাদা উৎপাত শুরু করলেন। রোজ সন্ধের পর অভ্যাসমতো বলেন—অ হরিশ!

কেউ উত্তর দেয় না।

মা আমাদের চোখ টিপে বারণ করে দিতেন বাবা বাড়ি আসেননি সে কথা বলতে, কারণ তাহলে ঠাকুরদাদা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবেন।

—অ হরিশ, বাড়ি এলি? অ হরিশ!

—আমি মায়ের শিক্ষামতো বলতাম—না, এখনো আসেননি বাবা।

—আজ কখন কাছারি গেল? আমাকে বলে গেল না?

আমরা উত্তর দিইনে।

—অ হরিশ।

ঠাকুরদা, তামাক সেজে দেব?

এটিও মায়ের পরামর্শ। ঐ একমাত্র উপায় ঠাকুরদাদাকে অন্যমনস্ক রাখবার। আমাদের বলতেন—বোস আমার কাছে।

আমি, আমার ছোট ভাই নীলু-ফুচু ও দুই বোন সরলা আর বিনু ঠাকুরদাদাকে ঘিরে বসি।

—সবাই এসেছে?

—হুঁ।

—বিনু এসেছে? আমার কাছে এগিয়ে এসে বোস সব। শোন, সুঁদরবনে একশ ছাপ্পান্ন লম্বর লাটে আমার মনিবের কাছারি ছিল। পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ। মস্ত বড় জমিদার। আমি যেখানে থাকতাম, সে কাছারির নাম ছিল গরানহাটির কাছারি। সুঁদরী আর গরান কাঠের জঙ্গল কিনা, তাই নাম ছিল গরানহাটি। একবার নোনাতলার খালে আমাদের ডিঙি লেগেছে, মাঘ মাসের দিন, জলে সোন নেমেছে—

—সে কি ঠাকুরদা?

—সোন মানে জোয়ার। বে-সোন মানে ভাঁটা—বে-সোনে নৌকো চলে না সামনে, নোঙর করতে হয় ও-দিকির গাঙে। তারপর কি বলছিলাম—

ওই হল মুশকিল। ঠাকুরদাদার কাছে গল্প শোনবার সুখ নেই, কেবল ভুলে যাবেন।

—বলছিলেন সোন নেমেছ জলে—

—হ্যাঁ, তার পর দেখি এক মস্ত বাঘ জলে ডিঙির পাশে জল খাচ্ছে। আমাদের সঙ্গে উজিরালি বিশ্বেস ছিল বড় শিকারী, সে অমনি বন্দুকে চোঙ বাগিয়ে এক দ্যাওড় করলে। এক দ্যাওড়, দু দ্যাওড়—ব্যাস, বাঘ উলটে পড়ল খালের জলে। হ্যাঁ মনু?

—কি?

—তোর বাবা এল?

—না, এখনো আসেননি।

—গিয়ে দেখে এস দাদাভাই আমার। অ হরিশ।

—আসেননি বাবা। গল্প বলুন ঠাকুরদা।

—দেখে এস না দাদাভাই।

—দেখতে হবে না, আসেননি। এলে আপনার সঙ্গে কথা বলতেন না?

ঠাকুরদা আবার গল্প বলতে শুরু করলেন। বাঘের গল্প জমাতে পারলেন না, কেবল ভুলে যান, আবার গোড়া থেকে শুরু করেন। উলটো-পালটা করে ফেলেন, কখন বলেন শিকারীর নাম উজিরালি বিশ্বেস, কখন বলেন তার নাম আজিমুদ্দি বিশ্বেস।

এমন সময় মা ভাত নিয়ে এলেন।

আমরা বললাম—ঠাকুরদাদা, ভাত এনেছে মা।

—ও, এস বৌমা। কি রাঁধলে?

—মাছের ঝোল আর চচ্চড়ি।

—হরিশ আসেনি বৌমা?

—না।

—এখনো এল না? রাত তো অনেক হয়েছে—

—রাত বেশি হয়নি। আপনি খেতে বসুন, আমি দুধ আনি।

—হরিশ এলে বলো আমার সঙ্গে যেন দেখা করে।

মা চলে গেলেন। ঠাকুরদাদার সামনে দাঁড়ালে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলতে হবে। ঠাকুরদাদা খাওয়া শেষ করে কিন্তু অন্য দিনের মতো শুতে গেলেন না, ঠায় অনেক রাত পর্যন্ত রোয়াকে বসে রইলেন, আর কেবল মাঝে মাঝে যার-তার পায়ের শব্দ শুনে বাবার নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেন।

অনেক রাত্রে মা বললেন—বাবা, আপনি এবার শুয়ে পড়ুন। ফুচুকে পাঠিয়ে দিই, আপনাকে শুইয়ে আসুক।

—হরিশ এসেছে?

—না।

—কেন এল না এখনো?

—আপনার কিছু মনে থাকে না, তিনি গোয়াড়ি গিয়েছেন মনে নেই? বুধবারে আসবেন আপনাকে বলে গেলেন যে—শুয়ে পড়ুন।

ঠাকুরদাদা বশে কি ভাবলেন। কথার উত্তর দিলেন না। হয়তো মনে পড়ল বাবার গোয়াড়ি যাওয়ার কথা। ফুচু গিয়ে তাঁকে শুইয়ে দিয়ে এল। অনেক রাতে শুনলাম, ঠাকুরদাদার ঘর থেকে কান্নার শব্দ আসছে। মা শুনে বললেন—দেখে আয় কি হল?

গিয়ে দেখি ঠাকুরদাদা বিছানার ওপর উঠে বসে কোণের দিকে হাত বাড়িয়ে লাঠি হাতড়াচ্ছেন। তিনি নাকি এখুনি বাবার সন্ধানে বেরুবেন। বাবা কেন আসেননি এখনো? তিনি মোটেই ঘুমুতে পারেননি নাকি! আমরা জানি, এ কথা ঠিক নয়। ঠাকুরদাদা বসে বসে ঢুলে পড়েন, তিনি না ঘুমিয়ে আছেন এত রাত পর্যন্ত। ইস, তা আর জানিনে!

ঠাকুরদাদাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলাম। অবশেষে মা গিয়ে কড়া সুরে বললেন—আচ্ছা বাবা, আপনার কাণ্ডখানা কি শুনি? ওরা ছেলেমানুষ, ওদের ঘুমুতে দেবেন না একটু? একশ'বার আপনাকে বলা হচ্ছে তিনি গোয়াড়ি গিয়েছেন, বুধবারে আসবেন, আপনি কিছুতেই তা শুনবেন না রাতদুপুরে উঠে বাধিয়ে দিয়েছেন গোলমাল। ও রকম করলে থাকুন আপনি সংসারে, আমি এক দিকে বেরুই।

মাকে ঠাকুরদাদা ভয় করতেন। মা ঘরে পা দিতেই তিনি বেশ নরম হয়ে এসেছিলেন, সুড়সুড় করে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

সকালে উঠে আমায় কাছে ডাকলেন—শোন মনু—

—কি?

—দাদাভাই, দাদু আমার, একটা পয়সা দেব এখন— ঠাকুরদাদা নিঃস্ব নিষ্কপর্দক লোক, তিনি পয়সা দেবেন এ কথা যদিও আমি বিশ্বাস করিনে, তবুও বলি—কি বলছেন?

—তোর বাবার চিঠি এসেছে?

—না।

—আজ কি বার?

—সোমবার।

—হরিশ কবে আসবে?

—বুধবারে।

—আচ্ছা যা।

বুধবারে বাবা কি জন্যে যেন এলেন না, কি জানি! ঠাকুরদাদা সারাদিন রোয়াকে বসে রইলেন, গম্ভীর মুখে তামাক খান আর মাঝে মাঝে বলেন—কে এল? অ হরিশ? কিসের পায়ের শব্দ রে, ও ফুচু, ও নীলু—

ফুচু বললে—আমাদের রাঙী গাই-এর বক্‌না, ঠাকুরদা।

—ও।

এই রকম চলল সারা দিন। রাত্রে খাবার সময় খেতে বসেছেন, আর মাঝে মাঝে কান খাড়া করে রেলগাড়ির শব্দ শোনবার চেষ্টা করছেন—মুখে কিছু বলেন না। হঠাৎ বড় গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন। আমি তামাক সেজে ঘরে ঢুকতেই চমকে উঠে বললেন—কে?

—আমি মনু।

—ন'টার গাড়ি গিয়েছে, জানিস?

—এখনো যায়নি। আপনি শুয়ে পড়ুন।

—শব্দ পাসনি গাড়ির?

—না।

—ও।

বাবার কথা মুখেও আনলেন না। বললেন—পান ছেঁচে এনেছিস? নিয়ে আয়—

বাবা তার পরদিনও এলেন না। ঠাকুরদাদা কিন্তু আশ্চর্য রকমের গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন। আর কিছু জিগ্যেস করেন না বা বাবার নাম ধরে ডাকেনও না।

শুক্রবার দিন সন্ধের গাড়িতে বাবা বাড়ি এলেন। ঠাকুরদাদা অভিমানে কথাই বলেন না। বাবা বুঝতে পারলেন। মাকে বললেন—বাবার দেখছি রাগ হয়েছে—যাই দেখি ব্যাপার।

ঠাকুরদাদা তামাক খাচ্ছেন, বাবা গিয়ে বললেন—বাবা!

পায়ারে ধুলো নিয়ে প্রণাম করলেন।

ঠাকুরদাদার মুখে কথা নেই।

—বাবা, কেমন আছেন?

ঠাকুরদাদা নিরুত্তর।

—বাবা, রাগ করেছেন নাকি? তা আমি আবার রাণাঘাট যাচ্ছি কাল সকালবেলা।

—রাগ হয় না?

এবার ঠাকুরদাদা আর কথা না বলে থাকতে পারলেন না। কেননা ওই যে বাবা বললেন, কাল সকালেই রাণাঘাট যাবেন, ওতেই ঠাকুরদাদার রাগ জল হয়ে গিয়েছে একেবারে।

বাবা হেসে বললেন—আপনি রাগ করতে পারেন, তবে আমি পরের কাজ করি, কাজ সারতে গেলে দু-এক দিন দেরি হয়েই যায়।

—আমার জন্যি কি আনলি?

—ভালো জিনিস এনেছি। আপনার ভালো লাগবে। কেষ্টনগরের সরভাজা?

—তা দিতে বল বৌমাকে।

সে-সময় মা কালীতলায় প্রদীপ দিতে গিয়েছিলেন। আসতে দেরি হল, ঠাকুরদাদা অধীরভাবে বার বার আমাকে বলতে লাগলেন—এল তোর মা, ও মনু?

বাবা চলে গিয়েছেন নটবর বাঁড়ুজ্যের চণ্ডীমণ্ডপে পাশা খেলতে। ঠাকুরদাদা আমাদেরই বার বার জিগ্যেস করতে লাগলেন—যা না তোর মার কাছে।

ঠাকুরদাদার উদ্বেগের ন্যায্য কারণ যে ছিল না তা নয়। মা ঠাকুরদাদাকে বিশেষ পছন্দ করতেন না গোড়া থেকেই। তাঁর জন্যে খাবার এলে, বাবা দাঁড়িয়ে থেকে না দিলে ঠাকুরদাদার ভাগ্যে অনেক সময় শুন্যের অঙ্ক লেখা হত, এ আমি জানি। মা বলতেন—ছেলে পিলেরা খাবে আগে, তা নয়, বাহাত্তুরে বুড়ো খোকনকে আগে খাওয়াও। অত আমার শ্বশুরভক্তি নেই। উনি আমার কি করেছেন কোন্ কালে? কখনো একখানা কাপড় দিয়েছেন পুজোর সময়—ওঁর হাতে যখন পয়সা ছিল, যখন পাইকপাড়ায় কাজ করতেন? আমি আজ আসিনি এ সংসারে, আমারও হয়ে গেল ত্রিশ বছর। আজই না হয় ভীমরতি হয়েছে, কোন্ কালে উনি ভালো ছিলেন? ওই ছেলে আর ছেলে! আর সব যেন বানের জলে ভেসে এসেছিলাম!

একটা নাড়ু কিংবা এতটুকু আমসত্ত্ব-ছেঁড়া পড়ত ঠাকুরদাদার ভাগ্যে।

বাবা নিজের হাতে খাবার নিয়ে ঠাকুরদাদাকে দিতেন বোধ হয় এই জন্যেই। আগে ঠাকুরদাদাকে না খাওয়ালে বাবার যেন তৃপ্তি হত না।

আষাঢ় মাসে ঠাকুরদাদা জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। আর উঠতে পারেন না। বাবা তাঁকে বিছানা থেকে উঠিয়ে মুখ ধুইয়ে কাপড় ছাড়িয়ে ওষুধ খাইয়ে দেন। বেদানার রস করে মিছরির গুঁড়ো মিশিয়ে খাওয়ান। কাছারি থেকে আসবার পথে ঠাকুরদাদার ঘরে কিছুক্ষণ বসে তবে এসে স্নানাহার করেন। কি উদ্বেগ তাঁর ঠাকুরদাদার অসুখের জন্যে।

মাকে বলতেন—বাবার জ্বর কত? দেখেছিলে? উনি তো ভুলে যান, ওষুধ ঠিকমতো দেবে।

সেরে উঠেও ঠাকুরদাদা প্রায় দু মাস বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারেন না। বাবা আজ ছাগলের দুধ, কাল কুমড়োর মেঠাই, পরশু আমলকীর মোরব্বা—সে যা বলে তাই জোগাড় করে নিয়ে এসে খাওয়ান, ঠাকুরদাদা গায়ে বল পাবেন বলে।

ঠাকুরদাদাও হয়ে গেলেন একেবারে বালক। তাঁর উৎপাতের জ্বালায় বাড়িসুদ্ধ লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। কেবল দিনরাত খাই-খাই আর একে ডাকছেন তাকে ডাকছেন। আমরা পারতপক্ষে কোনো দিনই কেউ ঠাকুরদাদার ঘেঁষ বড় একটা নিইনে, এখন তো একেবারে ত্রিসীমানায় ঘেঁষিনে। দশ ডাক দিলে একবার উত্তর দিই কি না দিই। মা ভাতের থালা দিয়ে আসেন নিয়ে আসেন, এই পর্যন্ত।

কথার জবাব দিলেও খুব হৃষ্টচিত্রে দেন না? যা দেন, তাও আবার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। অথচ সেই মা-ই নদীর ঘাটে বাঁড়ুজ্যেগিন্নির সঙ্গে এক ঘণ্টা ধরে হাবড়হাটি বকেন।

ঠাকুরদাদা অসহায় শিশুর মতো বাবার পথ চেয়ে বসে থাকেন। বাবার পায়ের শব্দ পেলেই সুর ধরেন—অ হরিশ, এলি? অ হরিশ!

আর ঠিক কি বাবার পায়ের শব্দ চেনেন ঠাকুরদাদা!

বাবা এসে নিজে দেখাশুনো করবেন, নাওয়াবেন খাওয়াবেন ঠাকুরদাদাকে। বাবা এলেই ঠাকুরদাদা যত কিছু অভিযোগ শুরু করে দেবেন। তাঁর কাছে ছেলেমানুষের মতো—বৌমা আমাকে এ করেনি, আমাকে তা দেয়নি। তাতে ঠাকুরদাদা মায়ের সহানুভূতি আরো হারাতেন।

বাবা তা জানতেনও। সেজন্যে নিজে সর্বদা খবরদারি করতেন।

কারো হাতে ঠাকুরদাদাকে ছেড়ে দিয়ে বাবার বিশ্বাস হত না, দিদি ছাড়া। দিদি তো শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছে।

পৌষ মাসে বাবা আবাদে গেলেন পৌষ-কিস্তির খাজনা আদায় করতে। বার বার মাকে বলে গেলেন ঠাকুরদাদার যেন অযত্ন না হয়।

মা বললেন—কেন, আমি কি বুড়োকে গলা টিপে মেরে ফেলব নাকি?

—ছিঃ, অমন বলতে নেই!

—না, তুমি সেই রকম কথাবার্তা বলছ কিনা তাই বলছি। তবে আমার সংসারের কাজকর্ম সেরে সব দিক দেখতে তো পারিনে। যত দূর পারি, চিরকাল যা হয়ে আসছে, তাই হবে।

—একটু মন দিয়ে—মানে, উনি বুড়ো মানুষ—

—আমি তা জানি। যা পারি হবে—ভেব না।

বাবা ঠাকুরদাদার কাছে বিদায় নেবার সময় কতদিন দেরি হবে তা ঠিক বললেন না। বললে ঠাকুরদাদা হয়তো যেতে দেবেন না কিংবা ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। বাবা যখন বেরুলেন, ঠাকুরদাদা বললেন—অ হরিশ, কবে ফিরবি?

তাঁর চিরন্তন প্রশ্ন।

—এই যত শিগগির হয় বাবা, আপনি ভাববেন না।

ঠাকুরদাদাকে ফেলে কোথাও গিয়ে বাবা স্বস্তি পেতেন না আমি জানি। ঠাকুরদাদা নাকি তিন বছর বয়স থেকে বাবা ও মার মতো করে মানুষ করেন বাবাকে ঠাকুরমায়ের মৃত্যুর পরে। বাবা যেন ভাবতেন ঠাকুরদাদা শত্রুপুরীর মধ্যে বাস করছেন—চতুর্দিকে শত্রুবেষ্টিত অবস্থায়—একমাত্র আপনার জন তিনি নিজে। চোখে চোখে রাখতেন এইজন্যে সর্বদা। কারো হাতে ছেড়ে দিয়ে বিশ্বাস করতেন না। বলা বাহুল্য, ঠাকুরদাদা তো নিজেকে অসহায় শত্রুবেষ্টিত বলে মনে করতেনই।

বাবা এবার বাড়ি ফিরতে বড় দেরি করতে লাগলেন।

অবশেষে যখন ফিরলেন তখন গরুরগাড়ি করে ভীষণ অসুস্থ অবস্থায়। ঘোর জ্বর। জ্বরের ঘোরে বলতে লাগলেন—বাবাকে কেউ বলো না আমি অসুস্থ হয়ে বাড়ি এসেছি।

ঠাকুরদাদা কিন্তু আন্দাজে মাঝে মাঝে বাবাকে ডাক দিতেন। বুঝতে পেরেছিলেন কিনা কি জানি?

—অ হরিশ! আমার জন্যি কি আনলি, অ হরিশ?

বাবা ঠিক শুনতে পান। জ্বরে ধুঁকতে ধুকতে বললেন—বাবা বাঁচতে আমার যেন কিছু না হয়, হে ভগবান। মরেও সুখ পাব না।

অসুখ বড় বাড়ল। জেলা থেকে ডাক্তার এসে দেখল দু দিন। সংসারের পুঁজি ভেঙে বাবার চিকিৎসা হল।

একদিন বড় বাড়াবাড়ি হল। ঠাকুরদাদাকে আর দেখাশুনো করার লোক নেই, বাবাকে নিয়েই সবাই ব্যস্ত। গ্রামের ত্রিলোচ্য ঠাকুরদাদার কাছে বসে তাঁকে বাজে গল্পে ভুলিয়ে রাখলে।

সবাই বলতে লাগল—সুবোধ আর বাঁচবে না। আহা, বুড়োর কি কপাল।

বাবার মৃত্যু হল শেষরাত্রে।

ঠাকুরদাদা তার কিছুই জানেন না। গভীর ঘুমে অচেতন।

খুব ভোরে বাড়িতে এসে ত্রিলোচন চক্রবর্তী ঠাকুরদার হাত ধরে ছুতো করে বাইরে নিয়ে গেল।

—চলুন জেঠামশাই একটু বড়দার বাড়িতে। আপনাকে একটু পায়ের ধুলো দিতে হবে সেখানে, তারা বলেছে।

—আমি যাব?

কান্নাকাটির চাপা শব্দে বলতে লাগলেন—কি রে,অ হরিশ, কি রে? কিসের শব্দ? সন্ধ্যায় আমরা বাড়ি এসে ঠাকুরদাদাকে ঘিরে বসি। হঠাৎ আমার বড় মমতা হল ঠাকুরদাদার অসহায় মুখের দিকে চেয়ে।

নতুন কেমন একটা মমতা—যা এতদিন মনের মধ্যে খুঁজে পাইনি।